বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.002

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতা : কৃষক-শ্রমিক প্রসঙ্গ

ইসমাইল সাদী*

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় বাংলা কবিতার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন শাসনে-ত্রাসনে ইতিহাসের বাঁকবদল কবিতার গতিপথকেও নতুন শপথে দীক্ষিত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা কবিতার মহাসড়কে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়, আঙ্গিক, শিল্পচিন্তা, স্বকীয় চিত্রকল্প-ভাবনা এবং শব্দ-ছন্দের নবমাত্রিক মর্যাদা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শাসক হিসেবে আবির্ভাবে সমাজে-সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কবিগণও। বর্তমানকালের মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগেও কৃষক-শ্রমিকই ছিল খাদ্য উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধির মূল কারিগর। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অসহায়ত্ব বিলোপ কিংবা অধিকার-ভাবনা নিয়ে উদাসীন থেকেছেন বেশির ভাগ শাসক। ফলে তাদের অর্থনৈতিক সংকট বেড়েছে বইকি কমেনি। যেহেতু একসময় খাদ্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষক-শ্রমিকের ওপর অবিকল্প নির্ভরতা ছিল, সেহেতু ধরে নেয়া হয়, কবিদের কবিতাশিল্পে বিচিত্র বিষয়, উপাদান ও প্রবণতার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ উপাদান এবং বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তারাও কি তৎকালীন কৃষক-শ্রমিককে দেখেছেন শাসকের চোখ দিয়ে? নাকি তাদের কাব্য রচনায় প্রভাব ফেলেছে কৃষক-শ্রমিক কিংবা অন্যান্য পেশাজীবীদের জীবনচিত্র? এসব জিজ্ঞাসার মীমাংসা-সন্ধানই এ-প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

চাবি শব্দ: প্রাচীন ও মধ্যযুগ, বাংলা কবিতা, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। বিশেষ করে চাষবাস, পশুপালন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি প্রকৃতি ও আবহাওয়া-নির্ভর শ্রমসাধ্য কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। নদীর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষত মাছ মানুষের খাদ্যতালিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর পাশাপাশি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নদীবন্দর কিংবা জলপথ ছিল মানুষের যোগাযোগ বা যাতায়াতের অপরিহার্য অবলম্বন। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলোতে কৃষিই ছিল মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সাধারণ এই প্রবণতা বিরাজমান।[১] নদীকে কেন্দ্র করে কেবল গ্রামীণ সভ্যতা নয়, নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠার দৃষ্টান্তও প্রচুর। অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক শ্রমবিকাশ কিংবা আধুনিক সময়ে শিল্পকেন্দ্রিক শ্রমের বিস্তার— সবই ঘটেছে নদী-তীরবর্তী এলাকাকে ঘিরে। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, সিন্ধুসভ্যতা প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত উন্নত সভ্যতার পত্তন হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের প্রধান নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ নদীমাতৃক। নিচু সমতল ভূমির কারণে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ কৃষির পক্ষে অনুকূল।[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ নামক যে ভূখণ্ডটি ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে, তার অবস্থানও ব্যতিক্রম নয়। কেননা, 'অখণ্ড বাঙলা গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা আর তারই শতশত শাখা-নদীর অবদান। সভ্যতা, সংস্কৃতি, জনপদ, রাষ্ট্রকেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ—সবকিছুই গড়ে উঠেছে এ-সকল নদনদীর তীরে। রাঢ়-পুণ্ড্র আর বঙ্গজনপদের মানসিক, রাষ্ট্রিক ও ইতিহাস প্রবাহের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য (sic) এবং পরিণতির প্রশ্নে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা অমোঘ ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সক্রিয়।'[৩] তাই জাতিগত স্বকীয়তা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, জীবনযাপনের ধরন, বহুবিধ পেশাজীবনের চারিত্র্য নির্ধারিত হয়েছে নদী-তীরবর্তী এসব শহরকে ঘিরে। বর্তমান বাংলাদেশ অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর অংশ এবং পৃথিবীর বৃহত্তর বদ্বীপগুলোর একটি। বাংলাদেশ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের মতো নদীবিধৌত পলিমাটিতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে ওরাওঁ, সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, চাকমা, ম্রো প্রভৃতি আদিবাসীর[৪] বসবাস। এ ছাড়াও বসবাস করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙালি জনগোষ্ঠীর লোকজন।[৫]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ধারায় এবং আধুনিক সাহিত্যে মানুষের বৃত্তি তথা শ্রমিকশ্রেণির পেশা এবং তাদের জীবনের নানা সংক্ষিপ্ত অনুষঙ্গ মাত্রাগত তারতম্যে ভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাব্য-উপাদানে সুনির্দিষ্টভাবে একটি বা দুটি পেশাজীবন নয়, বিভিন্ন পেশাজীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে জানা যায়:

> রাজা, রাজবংশ ও রাজধানীর উত্থানপতন যতই হোক না কেন বাঙলার সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন সে-অনুপাতে তেমন একটা হয়নি। কার্ল মার্কস এশিয়াটিক সমাজের যুগব্যাপী নিশ্চলতার কথা বলেছেন। সেই কথা বাংলার সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। একই পদ্ধতির চাষাবাদ, একই রকম কৃষি-যন্ত্রপাতি, একই পদ্ধতির মাছ-ধরার ব্যবস্থা, একই ধরনের পেশাভিত্তিক গ্রামীণ বন্দোবস্ত দীর্ঘদিন চলে আসছে। বাঙালি কৃষকের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঋতুচক্রে বাঁধা। প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য এখানে পাশাপাশি অবস্থান করেছে। অপচয় ও কৃচ্ছ্রতা কোনোটাই চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। হাজার বছর আগে চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যরা যখন পদ রচনা করেছেন, তখন 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী' বলে দুঃখ-জাগানিয়া শ্লোক তৈরি করেছেন।[৬]

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যার কোনো পদে পেশা হিসেবে কৃষিজীবীর সরাসরি উল্লেখ না পাওয়া গেলেও কৃষিজাত খাবার হিসেবে ভাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাতের উপস্থিতি মানেই ধান-চাল-কৃষি-চাষবাস-কৃষক ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কারণ, গুপ্তযুগ (স্থিতিকাল আনু. খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ থেকে চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধ), পালযুগ (আনু. ৭৫৬-১১০০), সেনযুগে (আনু. ১০৯৭-১২০৪) বাংলায় কৃষিকে কেন্দ্রকরেই বিভিন্ন শাসনকাঠামো গড়ে উঠেছিল। শাসন পরিচালনার কেন্দ্রীয় ভাবনায় থাকত কৃষি। আর চাষাবাদ হতো ধানসহ বিভিন্ন খাদ্যশস্যের। অথচ চর্যাপদ শুধু নয়, সমাজে কৃষি ও কৃষকের সরাসরি প্রভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগব্যাপী বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের অনেক নিদর্শনেই সরাসরি কৃষি বা কৃষক প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়নি। ইতিহাসবিদ গোপাল হালদার লিখেছেন:

> বাঙলার যে সামাজিক অবস্থায় প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্য উদ্ভূত (sic) হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অবস্থার প্রামাণিক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না।...ভারতের অন্যত্র যেমন বাঙলা দেশেও তেমনি এই পল্লীসমাজ ছিল কৃষি-প্রধান সমাজ; আর কৃষির যন্ত্রপাতি ও কৃষি-পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক; এখনো প্রায় তা-ই রয়েছে।[৭]

কৃষিভিত্তিক জীবন, কৃষিশ্রম, চাষবাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিকতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। যার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়। হয়তো এই কারণেই নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যে সেই নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> প্রাচীন বাঙলার কৃষি যে ধানোৎপাদনের এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লেখমালাগুলিতে ক্ষেত্রকরাণ্, কর্ষকান্, কৃষকান্ ইত্যাদি কথার তো বারবার উল্লেখ আছেই। জনসাধারণ যে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরাও ছিল বিশেষ একটি শ্রেণী...মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর বা কৃষকদেরও দান বিক্রয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞাপিত করিতে হইত।[৮]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূ-গঠন বৈশিষ্ট্য, ঘন ঘন রাজধানীর পরিবর্তন ইত্যাদি এবং সামন্ত সমাজের অচলায়তন-বৈশিষ্ট্যও এই নগরায়ণ বিস্তৃত না-হওয়ার হয়তো অন্যতম কারণ। তবে ইরফান হাবিব *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস : একটি সমীক্ষা* গ্রন্থে বাংলার বাইরে নগর-সভ্যতার বিকাশের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ-গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ শহরের নামও উল্লেখ করেছেন।[৯] চর্যাপদে কৃষি ও কৃষকের অনুপস্থিতি নিয়ে আনিসুজ্জামানের বক্তব্য ইরফান হাবিবের বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেকাংশে সাযুজ্যপূর্ণ:

> পাণিনির সময় থেকে বাংলাদেশে নগরের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত; টলেমির সময়ে তাম্রলিপ্তি এবং য়ুয়ান চোয়াঙের সময়ে মহাস্থান সমৃদ্ধ নগর ছিল। সুতরাং চর্যাগীতিতে গ্রামের অনুল্লেখের কারণ অন্যত্র নিহিত। আমাদের বিশ্বাস, চর্যাগীতিতে গ্রামজীবনের কোনো পরিচয় নেই এবং সেজন্যই এখানে গ্রামের নাম নেওয়া হয়নি। এই ধারণা শুধু অনুমাননির্ভর নয়। লক্ষ করা যাবে যে, চর্যাগানে কৃষির উল্লেখ প্রায় নেই বললে চলে।...টিলায় বসবাসকারী ব্যাধদের জীবনচিত্র বাদ দিলে চর্যাগীতির সবটাই নগরজীবনের চিত্র। অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ডোমদের বাস নগরের বাইরে হলেও নগর-সন্নিহিত স্থানেই।[১০]

আমাদের অন্বিষ্ট প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতার উপাদান ও শব্দবন্ধে কৃষক-শ্রমিকের প্রসঙ্গ কীভাবে বিধৃত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা।

চর্যাকারদের রচিত পদ বা সাধন-গীতির মধ্যে ওই সময়ের (আনু. ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রমজীবী মানুষের কথা বিধৃত হয়েছে। সে সময়ে এই অঞ্চলের সাধারণ বা খেটেখাওয়া অধিবাসীদের সংযুক্তি ছিল গুটিকয়েক পেশার সঙ্গে। চর্যাপদের সমাজচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁত তৈরি, চাঙারি বোনা, মাছ আহরণ, নৌকা চালানো, মদ চোলাই করা[১১] প্রভৃতি বৃত্তিকে ঘিরে আবর্তিত হতো মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এমনকি ডোমনির[১২] মতো শ্রমজীবী মানুষের কথাও চর্যাকারদের লেখায় এসেছে।

এরই মাঝে সমাজজীবনের কিছু চিহ্ন বা সংকেত পাওয়া যায়। তাঁদের সেই সৃজন-প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন পেশাজীবনের কথা উঠে আসে; চিত্রিত হয় সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার বাস্তবতা। সমাজের নিচু শ্রেণির পেশাজীবীর সঙ্গে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের পার্থক্য, তাদের বাসস্থান যে নগর থেকে দূরবর্তী এলাকায় প্রভৃতি বিষয় উল্লেখের পাশাপাশি এই সমাজসত্যও উল্লেখিত হয়েছে যে, 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।/ ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ।।'[১৩] অর্থাৎ ডোমজাতীয় পেশাজীবী নারী অস্পৃশ্য, তাই নগরের বাইরে তাদের বসবাস।

ডোম্বি আসা-যাওয়া করত নৌকায় এবং বাঁশের তাঁত, চুপড়ি ও চাঙাড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। 'রূপমুগ্ধ কামান্ধ' ব্রাহ্মণ তাদের কুঁড়েঘরের পাশে ঘোরাঘুরি করে। ডোমদের প্রধান পেশা ছিল চাঙাড়ি বোনা, নৌকা চালানো। আর তাদের প্রধান খাবার ছিল ভাত। অবশ্য অতি প্রাচীনকাল থেকে ভাতই এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এর বাইরে নিম্নে উদ্ধৃত চর্যায় তৎকালীন সমাজের একটা বিশেষ চিত্রও উঠে আসে, যা বতর্মান বাস্তবতার সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ:

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।। [১৪]

চর্যাকার শবরপা 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরী বালী।/ মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী'[১৫] পঙ্‌ক্তিতে 'সবরী বালী' বলে এক শ্রেণির পেশাজীবী প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'শবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ ব্যাধ; যাদের পেশা ছিল পশু শিকার করা। তারা মূলত উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিল। যাযাবর জীবন ছিল তাদের। আদিকালে বেশির ভাগ সময় শিকারই ছিল তাদের প্রধান পেশা। অনেকের মতে, বর্তমানে আমাদের সমাজের যে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীটি বেদে বা বাদিয়া বলে পরিচিত, যাদের প্রধান পেশা সাপ ধরা, তাবিজ-কবজ বিক্রি করা, পাখি শিকার করা বা সাপের খেলা দেখিয়ে উপার্জন করা, তারাই সম্ভবত চর্যাপদের শবর-শবরী। *বাংলাপিডিয়া*র বৈদ্যুতিন সংস্করণে 'শবর' নামক ভুক্তিতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> ব্রিটিশ শাসনের মাঝামাঝি শবররা উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তারা যাযাবর ও শিকারী ছিল। পরে তারা চা শ্রমিক হিসাবে মৌলভীবাজার জেলার হরিণছড়া, রাজঘাট ও নন্দরাণী এলাকায় বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে এ দেশে শবরদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।[১৬]

চর্যাকাররা সেই সময়ের সমাজের যেসব পেশাজীবীর প্রসঙ্গ তাঁদের সৃষ্ট পদগুলোতে উপস্থাপন করেছেন, তাতে তাদের সামাজিক অবস্থান বা পেশাজীবন কেমন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

নদীমাতৃক এই অঞ্চলে নৌকা পরিচালনা বা নৌপথকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের জীবন আবর্তিত হতো। কেননা, বিভিন্ন পদে সিদ্ধাচার্যরা নৌকা, দাঁড়, কাছি সেঁউতি, ভেলা, চকা, নৌবন্দর, নৌবাণিজ্য, পারাপার, পাটনি প্রভৃতি নৌ-সংশ্লিষ্ট শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। নৌবন্দর, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে গোপাল হালদারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> শুধু কৃষক নয়,...বাঙলায় বণিক শ্রেণীও উদ্ভূত হচ্ছিল, ছোট ছোট নদী-বন্দরও ছিল। অর্থাৎ কৃষি ও পণ্য উৎপাদন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে; এমন নয় কৃষি নেই, বণিকই বাংলা দেশে প্রথম পত্তন স্থাপন করেছে। সহজেই বোঝা যায়, এরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজে বণিক-শক্তির বিকাশের সুযোগ আসলে বেশি ছিল না।[১৭]

চর্যাপদ বিশ্লেষণে সমাজের বর্ণবিন্যাস অনুযায়ী যেসব জনগোষ্ঠীর পরিচয় বেশি পাওয়া যায়, তারা ছিল সেই সময়ের সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী। সেই কারণেই চর্যাগীতিগুলোতে তন্তুবায়, শৌণ্ডিক, ডোম, চণ্ডাল, শবর, কাপালিক, কামলি, চণ্ডাল, শুঁড়ি, ব্যাধ, মাঝি, তাঁতি, ধুনুরি, কাঠুরে, জেলে, পতিতা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় ও জীবিকার মানুষের উল্লেখ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে।[১৮] আর গৃহস্থ জীবনে নিত্যব্যবহার্য উপকরণের মধ্যে খাট, পিঁড়ি,

ঘড়া, হাঁড়ি প্রভৃতি এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পাওয়া যায় ভাত, মাংস, দুধ, মাখন, লাউ, তেঁতুল, পান প্রভৃতি। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাভি ও বলদের কথা উল্লেখ আছে।[১৯]

তবে চর্যাপদ তৎকালীন সমাজের পুরো শ্রমজীবনের চিত্রকে ধারণ করে কি না কিংবা চর্যাকারদের কৃষি বা কৃষিকাজে সম্পৃক্ত মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব ছিল কি না অথবা কৃষিজীবীদের কোনো কারণে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কি না, কিংবা অন্য কোনো পেশাজীবীর কথা বাদ পড়েছে কি না, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তবে সেই সময়ে কৃষি ও কৃষকের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। কেননা, ভাত, চাল, ধান, কৃষক, কৃষিজীবন একে অপরের পরিপূরক। যেহেতু চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন, তাই তাতে বাঙালি সমাজের কৃষিভিত্তিক বৃত্তিকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভাতকেও অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবেই মেনে নিতে হয়।

দুই

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের পর প্রাচীনত্বের দিক থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সময়ের বিস্তৃতি বা দূরত্বের দিক থেকে চর্যাপদ রচনার সময়সীমার শেষ থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য রচনার সম্ভাব্য সময়ের পার্থক্য দেড় শ থেকে আড়াই শ বছর (১৩৫০-১৪৫০ খ্রি.)। কিন্তু তারও আগে খনার বচনের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। খনা ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে নিপুণা ও বচন রচয়িতা বিদুষী নারী। খনার প্রকৃত নাম লীলাবতী বলে জানা যায়। তাঁকে নিয়ে রয়েছে অনেক কিংবদন্তি।[২০] তাঁর আবির্ভাব অনুমান করা হয় ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।[২১] খনা ও তাঁর বচনের ভাষা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন:

> ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাঙলার কৃষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। এগুলি ছিল জনসাধারণের মুখে মুখে বংশপরম্পরায়। ভাষার অদলবদল হইয়া বর্তমানে তাহা যে রূপ লইয়াছে তাহা মধ্যযুগীয়। তবু এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কী শস্য বুনিতে হইবে, কোন্ শস্যের জন্য কী প্রকার ভূমি, কী পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ...ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।[২২]

খনার বচনগুলোতে কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে, চাষবাস ও ফসলাদি সম্পর্কে, জলবায়ু, আবহাওয়া, এমনকি যাপিত জীবন, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও শ্রমজীবন সম্পর্কে যেসব উক্তি পাওয়া যায়, তা আজও বাঙালি সমাজের গ্রামীণ জনসাধারণ অনুসরণ করে আসছে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে।[২৩]

তিন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনির সঙ্গে পুরাণের কাহিনির মিল খোঁজেন অনেক সমালোচক। আবার অনেক সমালোচকের মতে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর কাহিনি যতটা না পৌরাণিক, তার চেয়ে বেশি লৌকিক, তত বেশি সামাজিক। আহমদ শরীফ (১৯২১-৯৯) বলেছেন, 'এটি লোকগীতি-নাট্য-ভিত্তিক রচনা—বড় জোর রতি সম্ভোগ কাব্য। কথকতাভিত্তিক কাঠামো রয়েছে বলেই এতে মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনাই বিবৃত।[২৪]

মূলত রাধা-কৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এর কাহিনি এগিয়ে গেছে; উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজচিত্র এবং কয়েক ধরনের শ্রমজীবী মানুষের পরিচয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের চরিত্রগুলো মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের, যাদের বসবাস মূলত নগর থেকে দূরবর্তী এলাকায়। স্বভাবতই তা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে সমাজজীবন বিধৃত হয়েছে, তার দুটি ধারা রয়েছে। এক. পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা; দুই. লোকায়ত সংস্কৃতির সমাজসংস্কার—যেখানে গোপপল্লি প্রধান হয়ে উঠলেও শ্রমনির্ভর অন্যান্য গোষ্ঠীরও উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[২৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর শ্রমজীবী হিসেবে এ-কাব্যে কুমার, তেলী, নাপিত, বৈদ্য, দৈবজ্ঞ, বণিক, ঐন্দ্রজালিক, সাপুড়ে, মাঝি, বাগদি, ব্যাধ, কাঠুরিয়া, যোগিনী, ডোম প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট পেশাজীবীর কথা জানা যায়। পেশাভিত্তিক বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে কাব্যে উঠে আসা অস্পৃশ্যতাবোধের চিত্রও লক্ষণীয়; যা চর্যাপদে ছিল নিচুস্তরের প্রতি উঁচুস্তরের। এগুলো হয়তো তৎকালীন সমাজের লোকবিশ্বাস। যেখানে দুটি নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়বিশেষের পেশা অন্য বর্ণের দ্বারা উপেক্ষিত বা নিচু বলে ভাবা হয়েছে। যেমন: তেলীর তেল বিক্রি করার জন্যে হাঁক শোনা রাধার কাছে যাত্রাকালের অশুভ সংকেত বলে মনে হয়েছে। অথচ রাধা ছিলেন একজন গোপবধূ; হাটে-গঞ্জে দুগ্ধজাত পসরার বিক্রয়িত্রী, নিতান্তই এক শ্রমজীবী।[২৬]

উল্লেখ্য, চর্যাপদের শ্রমজীবী মানুষের কাজের ধরনের মধ্যে যেমন সরাসরি কৃষক বা কৃষিজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না, তেমনি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যেও কৃষিজীবী বর্গের সরাসরি উপস্থিতি পাওয়া যায় না। তবে রাধার দুধ-দই বিক্রি করা আর কৃষ্ণকে রাখালরূপে উপস্থাপন এবং তার গরু চরানোর মধ্যে কৃষকজীবনের সামান্য সংকেত পাওয়া যায়। অথচ ইতিহাস ভিন্নকথা বলে। সুলতানী আমলের কৃষকদের ভূমিকর ও জীবনধারণ প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব লিখেছেন:

> সুলতানী আমলের প্রথম যুগে অভিবাসন ও দাসত্ব শহরাঞ্চলের শিল্পের বিকাশ ঘটালেও শহুরে জনগণ যার ওপর প্রধানত ভিত্তি করত তা আসত গ্রামাঞ্চল থেকে সুলতানী শাসক শ্রেণীকর্তৃক আহরিত রাজস্বের বৃদ্ধি থেকে।...এই আদায়ের মুখ্য রূপটি ছিল খরাজ, যা একধরনের ভূমিকর হিসাবে কৃষকের জীবনধারণে ন্যূনতম চাহিদার অতিরিক্ত উদ্বৃত্তের সিংহভাগের উপর রাজার দাবী সূচিত করত।[২৭]

চার

মধ্যযুগের আদি নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর সমসাময়িক কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীর (আনু. ১৪-১৫ শতক) রচিত *ইউসুফ জোলেখা*। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) আমলে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে এটি রচিত। ইউসুফ-জোলেখাকে নিয়ে কোরআনের কাহিনী অবলম্বনে ফারসি, এমনকি বাংলাতেও বিভিন্ন সময়ে কাব্য রচিত হয়েছে। সগীরের কাব্যের মূল আখ্যান অভিন্ন হলেও এখানে বড় হয়ে উঠেছে মানবপ্রেম। বলা যায়, 'কাব্যটিতে কোন বিদেশী আবহ নাই বলিলেও চলে। বাংলার পরিবেশ এই কাব্যের রক্তমাংস ও বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া

কাব্যখানি পাঠ করিতে মনেই হয় না যে, ইহা কোন বিদেশীর পুস্তকের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ।'[২৮] আর সে-কারণেই কাব্যে বর্ণিত দুর্ভিক্ষের সময় মিসর-রাজ শস্যের ভাণ্ডার খুলে দিলে অন্যান্য শস্যের নাম সরাসরি না এলেও বাংলার প্রধান খাদ্যশস্য ধানের প্রসঙ্গ আসে। এমনকি ইউসুফ তাঁর আপন ভাইকে কাছে রাখতে যে কৌশলের আশ্রয় নেন, সে-বিষয়ে আগে থেকে তাকে বলে রাখেন:

> ভাই সব সঙ্গে জাইতে তোহ্মাক ন দিমু।
> সঙ্কেত সন্ধান করি তোহ্মাক রাখিমু।।
> কনকের এক কাটা ধান্য মাপি দিতে।
> তোহ্মার গুণির মাঝে রাখিব গোপতে।।[২৯]

ইউসুফ-জোলেখা কাব্যে 'বাংলার আবহ ইহার প্রাণ বলিয়া'ই মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধানের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলার কৃষিজাত প্রধান খাদ্যশস্য ধানের উপস্থিতি কৃষিকেন্দ্রিক শ্রমজীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। প্রাচীনত্বের দিক থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও *ইউসুফ-জোলেখার* অব্যবহিত পর মধ্যযুগের সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্য ধারার আখ্যানকাব্যসমূহ। সমগ্র মধ্যযুগে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। মধ্যযুগে কেমন ছিল মানুষের শ্রমজীবন, সে-সম্পর্কে পূর্বাপর ধারণা পেতে এবং সেই সময়ের সমাজ ও সমাজের মানুষের জীবন ও পেশা সম্পর্কে জানতে মধ্যযুগে অব্যাহতভাবে চর্চিত মঙ্গলকাব্যের শরণ নেয়ার বিকল্প নেই। এ-সময়ে দেখা যায়, কৃষিকাজ মানুষের অন্যতম পেশা হিসেবে গণ্য হলেও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জীবনমান ভালো ছিল না। কারণ এ সময় ভূমিকর, বাসস্থান, কৃষিপণ্য, এমনকি গবাদি পশুর ওপরও কর চাপিয়েছিলেন শাসকগণ। এমন চাপে পড়ে কৃষকেরা কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আর ব্যবসায়ীরা তা শহরে সরবরাহ করেছেন।[৩০] এর বিকল্প হিসেবে শিল্প-কারাখানায় যুক্ত থেকে মানুষের শ্রম বিনিয়োগ করার কোনো সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না। বরং ধর্মীয় অবস্থান বা ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক স্তর অনুযায়ী পেশাগত পার্থক্য এ সময় প্রকট ছিল। যে-কারণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হতো পেশা-পরিচয়ের মাধ্যমেই। যারা ব্রাহ্মণ, তাদের কাজের ধরনের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের কাজ ছিল আলাদা। অর্থাৎ বর্ণ যেমন পেশা নির্ধারণ করে দিত, তেমনি পেশা দিয়েও সেই সময় মানুষের বর্ণ বা 'জাত' চেনা যেত। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই শ্রেণিকরণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ওই সময়ের মানুষের পেশা-পরিচয়।[৩১]

বাংলা মঙ্গলকাব্যেই মধ্যযুগের সমাজ ও মানুষের অবস্থার কথা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ধারার প্রথম রচনা বিজয় গুপ্তের (আনু. পঞ্চদশ শতাব্দী) *মনসামঙ্গল* (১৪৯৪) কাব্য *পদ্মাপুরাণ* নামেও পরিচিত। এতে উল্লেখ রয়েছে সমাজের উচ্চ-নিম্ন বর্ণের নানা জাতির মানুষের পরিচয়। কৃষকের উপস্থিতি ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ সময় জমিদার শ্রেণি যেমন ছিল, তেমনি ছিল কৃষক শ্রেণি। তাই 'বাংলা দেশে অপরের জমিতে চাষ করে এমন কৃষকের কথা ফারসি দলিলেও পাওয়া যায়। অনেকে গ্রামের সম্পন্ন চাষীদের দ্বারা নিয়োজিত হতো। তার প্রমাণ আছে পদ্মা-

পুরাণ-এ। সেখানে চাঁদ সদাগর মজুরের কাজ করেছিল এবং নিয়োগকর্তা কিষাণ লাগিয়ে চাষ করাত।'[৩২] যেমন:

ক্ষেতে আসিয়া চাষা ধরিলেক তারে।
ক্রোধ করি তারে লাথি চাপড় মারে।
গৃহস্থেরে বলে চান্দ মের নারে ভাই।
তোমার বাপের পুণ্যে কলাই শাক খাই।[৩৩]

বিভিন্ন পেশার শত শত লোকের উপস্থিতি দেখা যায় বেহুলার 'বিরহযাত্রা'র সময়ে। এর বাইরে মনসামঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মুসলমান, মোল্লা, কাজি, জোলা, ডোম-ডোমনী, দাসী, বাদী, চাষি, নাপিত, ওঝা, গোয়ালা, ধোপা, যুগী, কামার, কুমার, বাজিকর, ইত্যাদি শ্রেণির মানুষের বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৫৪০-১৬০০) রচিত মধ্যযুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য নিদর্শন *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের সব চরিত্রই সাধারণ। তারা আজকের সমাজের সাধারণ মানুষকেও প্রতিনিধিত্ব করে। *চণ্ডীমঙ্গলের* দুটি কাহিনি; একটি কালকেতু উপাখ্যান, অন্যটি ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। (আশুতোষ; ১৯৯৮: ৪৫৯) এ-কাব্যের কাহিনি দুটি কালকেতু-ফুল্লরা এবং ধনপতি-খুল্লনা আখ্যান হিসেবে বেশি পরিচিত। *চণ্ডীমঙ্গলে* সমাজের উঁচু শ্রেণির ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের উপস্থিতি রয়েছে। এর বাইরে পেশাজীবীদের মধ্যে গোপ, তেলি, বারুই, নাপিত, মোদক, কামার, মালী, কুম্ভকার, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, সুবর্ণবণিক, কাঁসারি, সাপুড়ে, কৈবর্ত, ধীবর, ধোপা, দরজি, শিউলি, ছুতার, মাঝি, চণ্ডাল, শুঁড়ি, চামার, ডোম, যাজক, জ্যোতিষী, ময়রা, বারবণিতা প্রভৃতি শ্রমজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ-কাব্যে অন্যতম চরিত্র কালকেতুর মাধ্যমে গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার কথা এসেছে। আমরা জানি, সময়টি ছিল মুঘল শাসনামলের। এ-সময় কৃষিব্যবস্থা খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছিল কৃষকদের ওপর আরোপিত করারোপের নানা পদ্ধতি। এ-সত্ত্বেও 'কৃষকদের শ্রমই ছিল মুঘলযুগের শোষকশ্রেণির বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস। এই শ্রমজাত উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনানুগ রাজস্বের মাধ্যমেই সংগৃহীত হতো না, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের "আবওয়াব" বা বেআইনি কর। কৃষক তার সংবৎসরের শস্যের একটি বিরাট অংশ আবওয়াব মেটাবার জন্যে দিয়ে দিত। মুঘল সম্রাটরা এই আবওয়াব সংগ্রহ বারবার নিষিদ্ধ করলেও কার্যত এগুলো কোনো সময় বাতিল হয়নি।'[৩৪] সাধারণ মানুষের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী হয়তো সে-কারণেই তাঁর চরিত্র দ্বারা পরিকল্পিত নগরে এই 'আবওয়াব' বাতিল করেছিলেন। তাই কৃষকদের গুজরাট নগরে বসবাসে উৎসাহিত করতে কবি নানান সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে 'বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু' অংশে কবির বক্তব্য:

শুন ভায়া বুলান মণ্ডল।
সন্তাপ করিব দূর আস্যই আমার পুর
কানে দিব কনক কুন্তল।।

মনে না ভাবিবে আন মূলে তোরে দিব ধান
গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।
যার যেবা নাহি থাকে সেই ধন দিব তাকে
কোন চিন্তা না করিহ মনে।।
আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর।।[৩৫]

এর আগে কাব্যে কৃষি বা কৃষকের উল্লেখ যেখানে ছিল সীমিত, সেখানে চণ্ডীমঙ্গলে এসে আমরা তা পাচ্ছি অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্টভাবে। কৃষি ও কৃষকের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে এখানে পাওয়া যায় ধান, গরু, লাঙল, চাষের কথা। কৃষিভিত্তিক সমাজে যে ধরনের অর্থনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়, সেগুলোর সমাধানের ইঙ্গিতও লক্ষ করা যায়। কৃষকের ধান বিক্রিতে কর কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, ব্রাহ্মণের জন্যও থাকবে বিশেষ সুবিধা। একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন এবং বিশেষত কৃষকের বিশেষায়িত সুবিধার কথা কালকেতুর গুজরাট নগরে প্রতিষ্ঠাকল্পে পাওয়া যায়।[৩৬] এ-কাব্যের বিভিন্ন অংশে খাদ্যশস্য বা খাবার-দাবারের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় কৃষিজীবীর কথা।

কালকেতুর গুজরাট নগরে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণাশ্রম বা বর্ণভেদ প্রথা অধিক ক্রিয়াশীল ছিল। এ-কাব্যের প্রধান চরিত্র কালকেতুর পেশা ছিল শিকার করা। সে-সময়ের অর্থনীতিতে এই পেশাজীবীদের উৎপাদিত কাঠ, জ্বালানি কাঠ, কাঠকয়লা, লাক্ষা, বুনো রেশন, পশুচর্ম, মধু, ভেষজ উদ্ভিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এ-সময়ের অরণ্য ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই অধিকতর সুফলা জমিগুলোকে প্রথমে কৃষির আওতায় আনা হয়েছিল।

মুঘলদের শাসনাধীন কালে রচিত *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে উঠে আসে কৃষক ও সাধারণ মানুষের সংকটের প্রসঙ্গ। এ-সময়ের কৃষক তথা সাধারণ মানুষ যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে ছিল, তার চিত্র ইরফান হাবিবের অন্য গ্রন্থসূত্রে প্রাপ্ত ওলন্দাজ এক পর্যবেক্ষকের মন্তব্য থেকে পাওয়া যায়। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ এমনই প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে যে তাদের জীবনের ছবি বা নিখুঁত বিবরণ দিলে বলতে হয় এই জীবন শুধু এক তীব্র অভাব ও নিদারুণ দুঃখের বাসভূমি। আলোচ্যপর্বে চাষিদের সাধারণ ভোগ্য ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের বিবরণ দিতে গেলে সেটি আসলে কোনোমতে টিকে থাকার জন্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় স্তরের রূপরেখা হয়ে দাঁড়াবে। তবে বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য যে ভাত-মাছ ছিল, সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।[৩৭] নিজের ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো সাধারণ ও শ্রমজীবী মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট লাঘবের মানসেই *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের স্রষ্টা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কালকেতু চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নের নগর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫২) কাব্যকে বলা হয় মধ্যযুগের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষাশৈলীর কাব্য। এ-কাব্যে কায়িক শ্রমভিত্তিক যেসব পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেসব হলো কুমার, পাল, ঘোষ, গোপ, নাপিত, পসারি, কৈবর্ত, ছুতার, স্বর্ণকার, শুঁড়ি, কোটাল, চূড়িদার, ডোম, মিরজাদা, বেনে, কাঁসারি, শাঁখারি, গোয়ালা, চাষা-ধোবা, চাষা-কৈবর্ত, বেদে, মাল, বাজিকর, মালাকর, রাজবংশী, পাটনি প্রভৃতির। ঈশ্বরী পাটুনী *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের খুব পরিচিত এক নাম, যিনি পেশায় ছিলেন খেয়াঘাটের মাঝি। শ্রমজীবী এই চরিত্রের একটি উক্তি এখনো জনপ্রিয় এবং বাঙালি সমাজে আজও প্রাসঙ্গিক।–

> ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
> একা দেখি কূলবধূ কে বট আপনি।।...
> আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
> চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।...
> প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
> আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।[৩৮]

এ-কাব্যের 'রন্ধন' অংশে পাওয়া যায় কৃষিপণ্য ও বিপুল খাদ্যশস্যের নাম। তাতে বোঝা যায়, তৎকালীন সমাজে কৃষি ও কৃষক ছিল অপরিহার্য অংশীদার। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলোতে যে ধরনের পেশাজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেক শব্দের অর্থ অভিন্ন। অনেক পেশা বিলুপ্তও হয়ে গেছে।

ছয়

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত *শিবমঙ্গল* বা *শিবায়ন* বা *শিব-সঙ্কীর্তন*ও মঙ্গলকাব্য ধারার একটি কাব্য। কবির সঠিক জন্মসাল জানা যায় না। তবে কাব্য রচনায় ভাষার ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় তিনি ভারতচন্দ্রের সমসময়ের কবি। *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের মতো *শিবমঙ্গল* কাব্যও বেশ কয়েকজন কবি রচনা করেছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিব-সঙ্কীর্ত্তন* (আনু. ১৭৫০) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি শিব-কাহিনিতে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এখানে শিব প্রধানত কৃষক; তবে কৃষক শুধু নন, নায়ক এবং কৃষকদরদিও। সে-কারণেই আহমদ শরীফের পর্যবেক্ষণ এ রকম:

> বাঙলা ও বাঙালীর লৌকিক শিব নামে দেবতা, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবহমান বাঙালী, তাঁর দাম্পত্যে, তাঁর বৈষয়িক জীবনে, তাঁর সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, লাভ-ক্ষতিতে তিনি অভাবক্লিষ্ট নিঃস্ব নিরন্ন ভ্রষ্টচরিত্র বাঙালী গৃহস্থ। তাই দেবতা থাকেন নি তিনি, নিত্যদেখা, নিত্যজানা আত্মীয় বন্ধু পরিজন তিনি, সেজন্যেই তিনি এতো আপন, এতো প্রিয়। তাঁর সঙ্গে গ্রামীণ গৃহী বাঙালীর ধন-মান ও শ্রেণীগত কোন ব্যবধান নেই।[৩৯]

এভাবেই প্রথমবারের মতো বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কোনো কাব্যে কৃষকের নায়ক হয়ে ওঠা; আর তা সম্ভব হয়েছে *শিবায়ন*-এর মধ্য দিয়ে। তবে এখানে 'শিব কেন্দ্রের হয়েও প্রান্তের, দেবতা হয়েও গার্হস্থ্য, কৈলাসে বসবাস করেও শ্মশানচারী, পিশাচেরা তাঁর অনুসারী অসুরেরা তাঁর ভক্ত; তিনি কিরাতরূপে আবির্ভূত হন, তিনি ভিক্ষা করেন, আবার কৃষির সূচনাও করেন।'[৪০]

ধারণা করা হয়, একসময় কৃষকের কল্যাণকর দেবতা হিসেবে কোচ সমাজে যে শিব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেটাই সম্ভবত *শিবায়ন* রচনায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকবে। মঙ্গলকাব্যগুলোতে শিবকে দেবতা হিসেবেই নানা ভূমিকায় দেখা যায়। দেশের সাধারণ মানুষ কৃষক। একমাত্র *শিবায়নেই* শিবকে সাধারণ কৃষক হিসেবে ফসল উৎপাদনে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। অবশ্য, কৃষকের উৎপাদন-বৃদ্ধির আদি দেবতাও ছিলেন কৃষকরূপে কল্পিত। *শিবায়ন*-এর সামাজিক আপস-রফার সূত্রে পৌরাণিক হিন্দুর সেই দেবাদিদেব এই কৃষক-দেবতার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। কৃষকের বাস্তব জীবনের মতোই গড়ে ওঠে *শিবায়নের* কৃষকের সংস্কার ও পরিকল্পনা। কৃষক-শিবের চরিত্র তা-ই নির্মিত হয় বাংলার প্রাকৃতজনের জীবনাদর্শে।[৪১] লোকসমাজে একটি প্রবাদ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত 'ধান ভানতে শিবের গীত'। এই শিবের গীতের শিবকে *শিবায়ন*-এ অলস কৃষক, কৃষিকাজে উদাসীন ও অভাবী হিসেবেও দেখা যায়। এমনকি তাকে একসময় ভিক্ষাবৃত্তি করতেও দেখা যায়। এই অবস্থায় পুরাণোক্ত সতী যখন পুনর্জন্ম লাভ করে গৌরী নাম ধারণ করেন, তখনই তাকে কৃষিকাজে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। শিব পরামর্শ মেনে ইন্দ্রের কাছ থেকে 'চাষ-ভূমির পাট্টা' গ্রহণ করেন; যদিও ইন্দ্র প্রথমে রাজি ছিলেন না। যখন দেখেন শিব চাষ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন, তখন রাজি হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

এরপর ভৃত্য ভীমের সাহায্যে কুবেরের কাছ থেকে ধানের বীজ সংগ্রহ করেন শিব: 'কল্পতরু কেবল কুবের পায়্যা ঘরে।/ ভীমের সহিতে শিবে সমাদর করে।।/ শিবের সংবাদ শুন্যা সুখী হৈল মনে।'[৪২] এরপর চাষের জন্য জমিও প্রস্তুত করেন শিব। কৃষিকাজের সঙ্গে গবাদি পশুপালনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিশেষত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের দিকে কৃষিকাজকে অত্যন্ত সম্মানজনক হিসেবে গণ্য করা হতো। অভিজাত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গৃহস্থরা স্বয়ং কৃষিজমিতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং ফসল সংগ্রহ করে ফিরতেন। এর জন্য সবাইকে ছেড়ে ছয় থেকে আট মাস কৃষিজমিতে থাকতে হতো। সেই সময় কৃষিকাজকে 'দেবকার্য্য' বলে বিবেচনা করা হতো।[৪৩] অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ সর্বজনীনতা লাভ করেছে। তাই কৃষিকাজ আর কেবল 'দেবকার্য' হিসেবে নেই; বরং শিল্প-কারখানা কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে কৃষিকাজ অবহেলিত পেশা এবং কৃষকেরা প্রান্তিক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ের মতো প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে নয়, সুরক্ষিত করার চেষ্টা করত মানুষ। ফলে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল চাষবাসের সমস্ত পরিকল্পনা। শুভক্ষণ কী, কখন চাষ করলে ফসল ভালো হবে, কী করলে গরু সুস্থ থাকবে, কোন সময় চাষবাস ক্ষতিকর বা নিষিদ্ধ প্রভৃতি জ্ঞান ছিল কৃষকদের, যা *শিবায়নেও* পাওয়া যায়। যেমন মাঘমাসের শেষ ভাগে বৃষ্টি হলে তাকে শুভক্ষণ গণ্য করা হতো যেমন:

মনে জান্যা মঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরিষিলা।।
দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।।[৪৪]

উপর্যুক্ত পঙ্ক্তিগুলোর তাৎপর্য তুলনা করা যায় বহুল প্রচলিত খনার বচন 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ ধন্য রাজা পুণ্যি দেশ'-এর সঙ্গে। তবে নিষিদ্ধ দিনে আবার প্রকৃতির নিয়মমাফিক কৃষিকাজের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে তৎকালীন কৃষকদের সচেতন থাকতে হালচাষ বন্ধ থাকলেও অন্যান্য কৃষিকাজ বন্ধ থাকত না। এ সময়গুলো কৃষকেরা ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করতেন।

সাত

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিচিত্র বিষয় ও ধারায় সমৃদ্ধ। এর মধ্যে শাক্ত পদাবলির বিষয় ও উপস্থাপন কৌশল অনেক বাস্তবসম্মত হওয়ায় কারও কারও রচিত কাব্যগীতিতে কৃষিজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। শাক্ত পদাবলি মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী কাব্যধারার নাম।

শাক্ত পদাবলিতে নারী শক্তি দুটি ধারায় মূল্যায়িত— উমা ও শ্যামা। এর মধ্যে পার্বতী, সতী, দুর্গা, উমা, চণ্ডিকা প্রভৃতি নাম ধারণ করে এই দেবীরূপ আবার মিলিতভাবে কালিকা বা কালী নামে বিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে এই কালী বা কালিকাই প্রধান।[৪৫] তবে প্রাচীন অনার্য সমাজে তিনি শতাধিক নামে পূজিত হতেন। দশমহাবিদ্যায় তার দশটি রূপ সুচিহ্নিত। তার উদ্দেশে নিবেদিত কাব্যগীতি এবং এর সঙ্গে বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ কৃষিভিত্তিক সমাজ সাধারণত মাতৃতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও তা-ই সত্য বলে মনে হয়। কেননা, বাঙালির ধর্মীয় জীবনে দেব অপেক্ষা দেবীর স্থান যে উঁচুস্থানে, তা থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষিভিত্তিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যত সহজে একটি পরিবার এবং তা থেকে এক-একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল গড়ে ওঠার সুযোগ পায়, যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তা সহজে সম্ভব হয় না।[৪৬]

শাক্ত পদাবলির কবিদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রজনীকান্ত সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, নরচন্দ্র রায় প্রমুখ বেশি পরিচিত। তাঁদের মধ্যে আবার রামপ্রসাদ সেনের পদাবলিতে যতটা মাটি ও মানুষের পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, অন্য কবিদের ক্ষেত্রে ততটা নয়। গান হিসেবেও রামপ্রসাদের পদগুলো যতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে, অন্যান্য কবির গান ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) বয়সের দিক থেকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমসাময়িক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিভার দিক থেকে ভারতচন্দ্রের পরই রামপ্রসাদকে গণ্য করা হয়। তিনি সাধক কবি হিসেবেও সর্বজনবিদিত। কারণ, তাঁর গান সম্পর্কে গোপাল হালদার বলেছেন, 'বাংলার মাটির গন্ধ আছে, মানুষের প্রাণকেও সেই অষ্টাদশ শতকে সে গীত স্পর্শ করেছিল। কোনো কোনো পদে এমন একটা ঘরোয়া ভাবের সরল শ্রী ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা আছে, যা লোকগীতে ছাড়া সাধারণত পাওয়া যায় না।'[৪৭]

এই যে জনচিত্ত, তাতে উপমা বা রূপকের মধ্য দিয়ে তিনি প্রবেশ করান বাংলার ঐতিহ্যকে, শ্রমজীবনকে, কৃষি-সংশ্লিষ্ট উপাদানকে। যেহেতু মাতৃশক্তিকে খুশি করার প্রয়াস থাকে শাক্ত পদাবলিতে, তাই রামপ্রসাদের শব্দচয়নও খুবই আকর্ষণীয় এবং মায়াময়। তিনি রূপকের আশ্রয় নিয়ে এমনভাবে কৃষি ও কৃষি-জমির কথা উপস্থাপন করেছেন, সহজে তার গূঢ়ার্থ বোঝা কঠিন

হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমরা অনুধাবন করতে পারি, কবিসত্তা কৃষি বা কৃষকের সঙ্গে সম্পর্কহীন হলে কখনোই এভাবে কারও লেখা সম্ভব নয়:

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।।
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হইবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।।...
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।।[৪৮]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-কবিতা আলোচনার নিরিখে বলা যায়, চর্যাপদে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র অঙ্কিত হলেও 'মঙ্গলকাব্যগুলোতেই প্রথম প্রান্তিক মানুষ অরণ্য বা পর্বত থেকে সমতলে এসে পৌঁছেছে।... পর্বতবাসী শিব নেমে এসেছে কৃষিজীবী কোচ-বাগদিপাড়ায়; অরণ্যচারী শিকারি জীবন ছেড়ে কিরাতনন্দন কালকেতু হয়েছে কোনো এক কৃষিনির্ভর জনপদের রাজা।'[৪৯] যেমন শাক্তপদাবলিসমূহে মাতৃ-মাহাত্ম্যের বাণী ধরা পড়লেও অনেক গীতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে কৃষি ও কৃষকের প্রসঙ্গ।

উপসংহার

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিভিন্ন শাষক গোষ্ঠীর কারণে নানাভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে এ-অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। ওই কালপর্বের সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজচিত্রের নানা অনুষঙ্গ। কবিদের অনবদ্য সৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের পেশাগত জীবন, জীবিকা নির্বাহের জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামের চিত্র চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হয়ে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলি প্রভৃতিতে ভাস্বর হতে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কবিদের শেকড় গ্রাম এবং কৃষিভিত্তিক সমাজ। তবে তাঁরাও ছিলেন ক্রমশ শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হওয়া জনগোষ্ঠীর একাংশ। প্রাচীনযুগ থেকে শুরু করে এখনো বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের জোগানদাতা হিসেবে কৃষক এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শ্রমিকের ওপর নির্ভরতা রয়েছে। ইতিহাসের আর্থসামাজিক পর্বগুলোতে লক্ষ করলে পাওয়া যায় অবিকল্প এই নির্ভরতা অতীতে আরও বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তৎকালীন সমাজের বেশ কিছু পেশা-পরিচয় তথা শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ এলেও সরাসরি কৃষকের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। মঙ্গলধারার কাব্যগুলোর আগে সরাসরি কৃষকের প্রসঙ্গ 'যেন সচেতনভাবে' অবহেলিত থেকে গেছে। পরবর্তী সময়ে রচিত *শিবায়নে* কৃষককে প্রথম নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এই স্বাভাবিকতা অন্য সব ক্ষেত্রে যে হলো না, তার মধ্যে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। সে-বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। কারণ, শত শত বছর ধরে যেমন কৃষক এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী, তেমনি প্রধান রাজস্ব জোগানদাতাও। আবারও কৃষকই সবচেয়ে বেশি শোষিত-বঞ্চিত। তাই আশা করা যেতেই পারত, বাঙালির মৃত্তিকাসংলগ্ন কবিগণ কৃষকশ্রেণিকে অতি আপনজন হিসেবে সব সময় প্রাধান্য দেবেন এবং কবিতাশিল্পকে

মহিমান্বিত করে তুলবেন। একইভাবে আধুনিক যুগের কবিতায় বিচিত্র বিষয়, উপাদান ও প্রবণতার পাশাপাশি কৃষক-শ্রমিকের জীবনপ্রসঙ্গও বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাওয়া ছিল প্রত্যাশিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে রাজনৈতিক নানা আন্দোলনের পাশাপাশি আলাদাভাবে নানকার বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলনসহ বেশ কয়েকটি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনও সংঘটিত হয়েছে। এ-সময়গুলোতে অনেক কবিকেই কলমের শক্তি নিয়ে কৃষক-শ্রমিকের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়। তবে কৃষক-শ্রমিকের প্রতি তাঁদের এই হার্দিক অবস্থান বেশিদিন স্থায়ী হতে দেখা যায় না। কৃষক ও শ্রমিকের রক্তে-ঘামে সমৃদ্ধ এই সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের এমন উদাসীনতা যেন সর্বযুগেই বিরাজমান। রাষ্ট্র তথা সমাজপরিচালনাকারী সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি যে কবিদের ওপরও আরোপিত হয় এবং হয়তো অজান্তেই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই কবিগণ পাঠ করেন কৃষক-শ্রমিকের চিরায়ত বঞ্চনাকে, উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার লক্ষণ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে দেখা যায়। ফলে এ-বিষয়ও উন্মোচিত হয় যে, সব শ্রেণির মানুষের ভাগ্যের উন্নতি ঘটলেও কৃষক-শ্রমিক থেকে যায় তাদের 'চিরবঞ্চিত' এবং 'অপরিবর্তনশীল' অবস্থানে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ এমন শহরও আছে, যেগুলো বিখ্যাত এবং সেগুলো নদী-তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত নয়। তবে প্রাচীনকালে নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা শহরকে কেন্দ্র করে যতটা কর্মচাঞ্চল্য বিরাজ করত, তেমনটা নদীবিহীন শহরে দেখা যায় না।

২ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২, পৃ. ১৩৭

৩ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাঙলাদেশ', *বাঙলাদেশ* (সম্পা. মনসুর মুসা), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২২

৪ বর্তমানে আদিবাসী শব্দ ব্যবহৃত হলেও একসময় 'উপজাতি' ব্যবহৃত হতো। লেখকও তা-ই ব্যবহার করেছেন। তবে শব্দটি বর্তমানে বাংলা ভাষায় তুচ্ছার্থ-নির্দেশক শব্দে পরিণত হয়েছে। যে-কোনো অঞ্চলের আদি বাসিন্দারা নানা কারণে ক্রমশ সংখ্যায় কমে যেতে পারে। তাই বলে জাতিত্বের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় না। সে-কারণে উপজাতি নয়, তাদের আদিবাসী বা আদি নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা উচিত।

৫ রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, পৃ. ১৬

৬ মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ১১

৭ গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৪০০, পৃ. ১১

৮ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, ১৩৫-১৩৬

৯ ইরফান হাবিব তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কুৎব, দিল্লি, কিলোখ্‌রি, সিরি, তুঘলকাবাদ, ফিরোজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে জনবসতি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে পাথর, ধ্বংসস্তূপ ও ইট থেকে যেসব চিহ্ন পাওয়া যায়, তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৩০ সালে ইবনে বতুতা দিল্লি শহরের সুবিশাল বিস্তার ও এর জনসংখ্যার বর্ণনা করেছিলেন। এ-গ্রন্থে এর বাইরেও লাহোর, মুলতান, লক্ষ্ণৌ, অনহিলওয়াড়া প্রভৃতি শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। [সূত্র: ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস: একটি সমীক্ষা* (অনু. সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ ও প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪]

১০ আনিসুজ্জামান, *স্বরূপের সন্ধানে*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯, পৃ. ২৬-২৭

১১ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০২, পৃ. ৬৭

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৩ প্রাগুক্ত পৃ. ৮৫

১৪ প্রাগুক্ত পৃ. ১৪২
১৫ প্রাগুক্ত পৃ. ১২৮
১৬ https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A6%B0
১৭ গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৯ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২০ একটি কিংবদন্তি অনুসারে খনার নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের দেউলি গ্রামে। পিতার নাম অনাচার্য। চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রম চন্দ্রপুরে তিনি বহুকাল বাস করেন। অপর কিংবদন্তি অনুসারে তিনি ছিলেন সিংহলরাজের কন্যা। শুভক্ষণে জন্মলাভ করায় তাঁর নাম রাখা হয় ক্ষণা বা খনা। (সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৩, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩)
২১ খনার বচনগুলো আমাদের লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। শস্য উৎপাদন, গৃহনির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে খনার বচন রয়েছে। যেমন কয়েকটি শস্যের চাষপদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'ষোলো চাষে মূলা। তার অর্ধেক তুলা।/তার আর্ধেক ধান। বিনা চাষে পান।' এ ছাড়া খনার বচন শুধু আমাদের ভাষায় প্রচলিত নয়। বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার, নেপাল, তিব্বতসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজে খনার বচন পরিচিত ও আদৃত। [সূত্র: সিরাজুল ইসলাম সম্পা., *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২১]
২২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭
২৩ পূরবী বসু, *কিংবদন্তির খনা ও খনার বচন*, ঢাকা, অন্যপ্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১-২
২৪ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (প্রথম খণ্ড), ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৮, পৃ. ১৯৯
২৫ নরেশচন্দ্র জানা (সম্পা.), *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনচর্চা*, কলকাতা, দে পাবলিকেশনস, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৫
২৬ *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যে যেমন প্রায় সমগোত্রীয় বা সমমর্যাদার এক পেশার শ্রমজীবীর অন্য পেশার শ্রমজীবীকে অবজ্ঞা করতে দেখা যায়, তেমনি কালো কাককে কুলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।। যেমন: 'ঘরের বাহির হৈতেঁ/তেলিনি তেল বিচিতেঁ/ কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।/ আগেঁ সুনা ঘটে নারী/ হাঁছী জিঠিহো না বারী/ চলিলোঁ তাহার উচিত পাঁও ফলে।। (অমিত্রসূদন; ১৯৯৬: ২৫১)
২৭ ইরফান হাবিব, প্রাগুক্ত, ৮
২৮ মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), *শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩, পৃ. ৭২
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৩০ ইরফান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩১ ভীষ্মদেব চৌধুরী, *বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণা ও অন্যান্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃ. ১৯৫
৩২ গৌতম ভদ্র, *মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ*, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৭
৩৩ অমৃতলাল বালা [সম্পা.], *বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা গবেষণা সংসদ, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৪
৩৪ গৌতম ভদ্র, প্রাগুক্ত, ৫১
৩৫ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *কালকেতু উপাখ্যান*, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০২, পৃ. ৮৮
৩৬ সিরাজ সালেকীন, *কবিতায় নৃগোষ্ঠী: মূলত কেন্দ্র থেকে দেখা*, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ২০২০, পৃ. ৪৯
৩৭ ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭), কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৯, পৃ. ৯৬-৯৭
৩৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান*, ঢাকা, *ষ্টুডেন্ট ওয়েজ*, ১৪০৫, পৃ. ১৪-১৫
৩৯ আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ৪২৯
৪০ সিরাজ সালেকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪১ গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৪২ যোগিলাল হালদার [সম্পা.], *রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন*, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ২৩০

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; আশুতোষ, ১৯৯৮, পৃ. ৩

৪৫ ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় [সম্পা.], *শাক্ত পদাবলী*, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৯৪, পৃ. ৩

৪৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ. ৩

৪৭ গোপাল হালদার, প্রাগুক্ত, ২১৮

৪৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা [সম্পা.], *মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃ. ২২১

৪৯ সিরাজ সালেকীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩